২৬-১০-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মণ। অতএব তোমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক-অনেক প্রেম-প্রীতি অবশ্যই থাকা উচিত। নিজেরা সবাই একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কি ভাবে সত্য-বাবার পরিচয় সবাইকে জানানো যেতে পারে।

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, কোন্ নিশ্চয়তার আধারে তোমরা নিজেদের ভাগ্যকে অনেক উন্নত করতে পারো ?

উত্তর :- সর্বাগ্রে বুদ্ধিতে এই নিশ্চয়তা সুদৃঢ় হওয়া দরকার যে, এই ঈশ্বরীয় পাঠের শিক্ষক স্বয়ং পরমাত্মা। ওঁনার থেকেই তোমাদের সেই সৌভাগ্য পেতে হবে- এমন ভাব এলেই তোমরা রোজ ওঁনার এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে নিজেদের সৌভাগ্যকে আরও উন্নত করতে পারবে। বাবার শ্রীমৎ এটাই - বাচ্চারা, যে কোনও অবস্থাতেই এই পাঠ কিন্তু রোজই পড়তে হবে। আর যদিও বা ক্লাসে আসতে না পারো, তবে ঘরে বসেই মুরলী পড়তে হবে রোজ।

গীত :- তু প্যার কা সাগর হ্যায় ....
(তুমি যে প্রেমের সাগর, তাই তার এক ফোঁটার জন্য তৃষ্ণার্ত যে মোরা।)

ওঁম্ শান্তি ! আত্মারা অর্থাৎ তোমরা বাচ্চারা নিজেরা এখন অবগত যে, আত্মা ক্ষুদ্র একটা বিন্দুর মতন। যা অতি ক্ষুদ্র তারা আকারের। কিন্তু আত্মা নিজে কিভাবে নিজেকে ও তার বাবা পরমাত্মাকে অনুভব করবে ? জগতের লোকেরা না তো নিজেকে আর না তো তাদের (আত্মাদের) বাবা পরমাত্মাকে জানতে পারে। কিন্তু তোমরা একথা জানো - তোমরা নিজেরা আত্মা, বিন্দুরূপ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা অতি ক্ষুদ্র আকারের। আত্মার বাবা পরমাত্মাও বিন্দুস্বরূপ। পরমাত্মা আত্মার বাবা হলেও আকার উভয়েরই সমান। (আত্মা যখন শরীর ধারণ করে) কেবল তখনই শরীরের আকারে ছোট-বড় হয়। তোমরা এখন পরমাত্মা শিববাবাকে স্মরণ করতে বসেছো। কেউ যখন এই তথ্য জানতে পারে যে, আত্মার আকৃতি এত ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাতেই ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট ভরা থাকে, তখন সে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু, যতক্ষণ না আত্মা কোনও শরীরের আধার পায়, ততক্ষণ সে তার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতেই পারে না। একই প্রকারে যদিও পরমাত্মাও আমাদের আত্মার মতনই ক্ষুদ্রাকারের, তবুও ওনাকে বাবা বা পরম্ কেন বলা হয় ? --যেহেতু উনি সদাকালের পবিত্র। জগতের লোকেরা পরমাত্মার এসব তথ্য না জেনেও কিন্তু, তারাও ওনাকে বাবা বলেই ডাকে। অর্থাৎ তোমরা পরমাত্মাকে সঠিক ভাবে জেনে পদ্ধতি অনুসারে ওনাকে স্মরণ করো আর সেসব না জানা সত্ত্বেও অন্যেরাও কিন্তু ওনাকেই স্মরণ করে। জগতে যে এত প্রকারের ভক্ত আছে, সব ভক্তরই ভগবান কিন্তু এক ও একজনই, যাকে পতিত-পাবন বলা হয়। অতএব পতিত-পাবন হলেন একজন আর পতিত অসংখ্য। সাধু-সন্ন্যাসী, মহাত্মারাও তাকেই স্মরণ করে, আর ঈশ্বরীয় পিতা বলে ডাকে। অতএব এর অর্থ হলো উনিই সবারই পিতা। তাই এই কারণেই তো বাবাকে আসতেই হয়, পতিত বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাবার জন্য। আবার সেই পবিত্র হবার উপায়ও তিনিই বলে দেন। যেহেতু বাচ্চাদের আত্মাতে অনেক পাপের বোঝা চেপে আছে যে। বাচ্চারা কেবল একে অন্যকে স্লোগান লিখে জানায়, "পবিত্র হও", তাতে কিন্তু কোনও ফলই হয় না, যেহেতু বাইরের লোকেরা এসবের মর্মার্থই তো জানে না। যদিও তোমরা অর্থাৎ বি.কে.-দের এর সঠিক অর্থ বোঝানো হয়েছে। সুতরাং তোমাদের আর এই স্লোগানের প্রয়োজনই বা কি ! এর অন্তর্নিহিত অর্থ

হলো, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, আর পবিত্র হতে থাকো। যতক্ষণ না পর্যন্ত কারওকে সেভাবে না বোঝানো যায়, ততক্ষণ সে এসব বুঝবেই বা কি প্রকারে। বাবার সাথে যোগে যোগযুক্ত হতে পারলেই পবিত্র হওয়া যায়। তাই তো ওঁনাকে বলা হয়ে থাকে 'হিজ হোলীনেস'- যা পবিত্রতার উপাধি। (যেমন খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপের উপাধি) সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেও এমন বলা হয়, যেহেতু তারা কোনও প্রকার বিকারের মধ্যে যান না। যদিও তারা বিকারে যান না, স্মরণ করে ব্রহ্ম-তত্বকে, কিন্তু তাদের জন্ম তো হয় বিকারীদের কাছে।

তোমাদের বলা হয়, পবিত্র থেকে কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। সন্ন্যাসীরা নিজেদেরকে জাগতিক-সংসারিক গৃহস্থালীর কর্ম-কর্তব্য থেকেই সন্ন্যাস নেন। অথচ কর্ম-সন্ন্যাস বলে কিছু হয় না। কর্ম-সন্ন্যাস একমাত্র তখনই হতে পারে, যখন দেহ আর থাকে না। আর দেহ বিনা আত্মা তো আত্মাদের ঘর পরমধামে থাকে। তবে এই জগতে কর্ম-সন্ন্যাস হয় কিভাবে ? তাই একথা বলাটাই তো মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এর যুক্তিতে তারা বলে, গৃহস্থরা যেসব কর্মাদি করে থাকে, ওনারা তো আর তা করেন না। কিন্তু, গৃহস্থরা যেমন যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ ইত্যাদি করে থাকে, সন্ন্যাসীরাও তো সে সবই করে। তফাৎ শুধু এটুকুই যে, গৃহস্থীরা রোজগার করে, তাদের ঘরেই রান্না-বান্না করে খায়-দায় কিন্তু সন্ন্যাসীরা তা করে না। তারা কেবল ভিক্ষান্নই খেয়ে থাকে, যেহেতু তারা হঠযোগী। যে হঠযোগের সাহায্যে ঈশ্বরের সাথে মিলন হয় না আদৌ। যখন বাবা স্বয়ং এই ধরায় আসবেন, একমাত্র তখনই তো তার সাথে কারও মিলন হতে পারে। তেমনি, যতক্ষণ না বাবা আসছেন, ততক্ষণ পবিত্র দুনিয়া স্থাপনার কার্য শুরুও হতে পারে না। তোমরা যতই এসব যুক্তি বোঝাও না কেন, তবুও তারা তা বোঝারর আগ্রহ দেখাবে না। বাচ্চারা বাবাকে চিঠি লিখে জানায়, এই এই আত্মা এত সংখ্যায় এখানে এসেছে। এখন দেখার আছে, এর মধ্যে কে কে তাদের নিজেদের ভাগ্যকে সৌভাগ্য বানাতে পারে। আসে তো এখানে অনেকেই, কিন্তু অনেকের বুদ্ধিতে এটাই তো ঢোকে না যে, এই ঈশ্বরীয় পাঠশালার শিক্ষক স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা। অতএব ওনার কাছ থেকেই ভাগ্যকে সৌভাগ্য বানিয় নিতে হবে। বাবা স্বয়ং আবার হাজিরার রেজিস্টার খাতাও দেখেন। কেউ মাসের মধ্যে ৮ থেকে ১০ দিন আসে, অনেকে আবার তাও আসে না, ফলে তারা তাদের হাজিরা লিখতে পারে না। আর কেউই যদি ক্লসে না আসে তবে তখন ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী মুরলী পড়বে নাকি পড়বে না। এক্ষেত্রে বাবা বলছেন, যে কোনও অবস্থাতেই প্রত্যহই মুরলী পাঠ করা আবশ্যক। শিখদের মধ্যেও এই নিয়ম আছে। তারা ছোট-ছোট আকারের 'জপ-সাহেব' 'সুখমনী' (গ্রন্থ সাহেব থেকে নিয়ে ছোট ছোট গ্রন্থ) বানায়। যেহেতু তারা বিশ্বাস ও মান্য করে, যে কোনও অবস্থাই আসুক না কেন, তাদেরকে তা পড়তেই হবে। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো, তা পড়লে তাতে প্রাপ্তি আর কি বা হবে,-- কিছুই না। হয়তো কিছু সময়ের জন্য মন-বুদ্ধি ঠিক থাকবে। কিন্তু তাতে তো আর বাবার সাথে মিলন হবে না। এমন ভাব এলে, ঠিক তখনই তারা বিকারের জালে ফেঁসে যায়। যার ফলে তাদের আর কোনও প্রাপ্তিই ঘটে না। তাই তো প্রবাদ আছে, বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি।

বিনাশ যেখানে এখন দোর-গোড়ায়, তবুও অনেকেই এখনও পরমাত্মাকে জানতেই পারলো না। লোকোরা তা স্বীকারও করে যে, রচয়িতা এবং তার রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে তারা জানেই না। কিন্তু এই অবিনাশী ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানা যে অবশ্যই দরকার। এ বিষয়েই বাবা জানাচ্ছেন, আদি হলো সত্যযুগ আর অন্ত হলো কলিযুগ। এভাবেই তিন-কাল, (আদি-মধ্য-অন্ত) আর

তিন-লোককেও জানতে হবে। তিন লোক অর্থাৎ স্থুল-বতন (সাকার মনুষ্য লোক), সূক্ষ্মম-বতন (দেবলোক), ব্রহ্মলোক বা পরলোক ..... লোকেরা বলে থাকে শাস্ত্র অনাদি, অথচ বাবা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলেন, যখন থেকে রাবণের রাজত্ব শুরু হয়েছে, তখন থেকেই শাস্ত্রের শুরু। অর্থাৎ তা কল্পের মধ্যবর্তী সময় দ্বাপর থেকে। অর্দ্ধকল্প সত্যযুগ আর বাকী অর্দ্ধকল্প কলিযুগ। তাদের এই হিসাব কেবল শেষের অর্দ্ধকল্পের হিসাব। অজ্ঞতার কারণে তারা প্রথম অর্দ্ধের হিসাব দিতেই পারবে না। যেহেতু তারা মধ্যবর্তী সময়ের বিষয়ে কিছুই জানে না। উল্টে আবার কল্পের আয়ুকে লক্ষ-লক্ষ বছর বলে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা তাদের বলতে পারো, তারা কিন্তু বাবার কাছে গিয়ে এসবের সঠিক হিসাব জেনে নিতে পারে। এর সাথে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী হলে তোমরাও বাবার আশীর্ব্বাদী-বর্সাও পেতে পারো। যারা আসবে প্রথমেই তাদের কাছে জানতে চাইবে, তোমরা এখন এখানে অর্থাৎ কোথায় এসেছো ? তখন তারা হয়ত বলবে, বি. কে.-দের কাছে। তখন তোমরা বলবে, এবার তবে নিজেরাই বিচার করে দেখ, এখানে যখন এত সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী আছে, তবে সেখানে ব্রহ্মা অর্থাৎ যিনি বাচ্চাদের বাবা তিনিও অবশ্যই আছেন এখানে। আবার, এখানকার মতন আরও কত অনেক সেন্টার আছে, সেখানেও নিশ্চয় অনেক সংখ্যায় এমন ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী আছে। এবার বিচার করো, একজন বাবার এত অনেক বাচ্চা হলো কি করে! ঐ যে বোর্ডে লেখা আছে প্রজাপিতা (প্রজাদের পিতা), সেই হিসাবেই তো এত অসংখ্য ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। এইভাবে বোঝাতে বোঝাতে তাদেরকে সজাগ করতে হবে। তাদেরকে বলো- এরপর লক্ষ্য করো, যিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা তিনি তবে কার সন্তান ? আর একসাথে এত বাচ্চার রচনা, তা তো কেবল পরমাত্মার দ্বারাই সম্ভব। অতএব পরমাত্মা অবশ্যই আসেন এখানে। আর তাই তো পরমাত্মার উদ্দেশ্য এমন গীতও রচিত করা হয়েছে - তুমিই আমাদের মাতা, আবার পিতাও তুমি। সেক্ষেত্রে ব্রহ্মা মাতার ভূমিকায় আসে, -তাই না ? পরমপিতা পরমাত্মাই ব্রহ্মাকে রচনা করে তার দ্বারা আমাদের সবাইকে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীতে পরিবর্তিত করান, অর্থাৎ দত্তক নেওয়ান। পরমাত্মার আশীর্বাদী-বর্সাও তার মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হও কিভাবে ? -যখন তোমরা পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত হও। সেই উদ্দেশ্যেই বাবা বলেন, যাবতীয় সবকিছু ভুলে থেকে একমাত্র ওনাকেই নিরন্তর স্মরণ করতে। বাবা বলছেন, সবাই তো আমাকে উদ্দেশ্যে করেই বলে - বাবা হচ্ছেন- নলেজফুল, ব্লিসফুল, লিবারেটর, গাইড। ফলে বাবাকেও তা করতেই হয়। এছাড়াও সবাইকে সুখধামেও নিয়ে যেতে হয়। আচ্ছা, প্রকৃত সুখ কোথায় ? --সুখধামে। তোমাদেরকে বাবা প্রথমে নিয়ে যান শান্তিধামে, তারপর সেখান থেকে আত্মারা আসে সুখধামে। কিন্তু একথা তোমরা স্মরণে রাখবে কি করে ? -- প্রত্যহই এই কথাকে স্মরণ করতে হবে এবং অন্যদেরকেও তা ব্যাখ্যা করে শোনাতে থাকবে। তবেই বোঝাবার জন্য যুক্তিযুক্ত পয়েন্টগুলি আসতে থাকবে বুদ্ধিতে। এসব যখন কারওকে বোঝাবে, তখন তার থেকে তা লিখিয়েও নেওয়া উচিত। তাদের থেকে এটাও লিখিয়ে নিতে হবে, পরমাত্মা অর্থাৎ আত্মাদের পিতা যিনি, ওঁনার ঠিকানাই বা কি ? আত্মাদের বাবা যখন শিববাবা তখন তো ওনার সম্পত্তি বা আশীর্বাদী-বর্সার অধিকার আত্মাদেরই অর্থাৎ আমাদের। তার জন্য অবশ্য উপযুক্ত পুরুষার্থও করতে হবে। কিন্তু অত কষ্ট আর কে বা করে ? বাচ্চারা, তাই তোমাদেরকেই দাঁড়িয়ে থেকে, নিজেরা সজাগ থেকে, অন্যদেরকেও সজাগ করে, তাদেরকে সেবার প্লান-প্রোগ্রাম বানিয়ে দিতে হবে। যেমন মিলিটারীতে বড় কমাণ্ডার তার টীমের সাথে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে সব ঠিক করে নেয়। বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের মধ্যেও তেমন আলোচনা করা উচিত। কিন্তু তোমরা নিজেরা যদি তা না করো,

তবে সেক্ষেত্রে বাবা আর কি বা করতে পারে। বাস্তবে, তোমরা ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে খুব সুপ্রীতি-সদ্ভাব থাকা উচিত। কাকে কিভাবে বোঝাতে হবে, এ বিষয়ে সহমতে এসে কোনও সিদ্ধান্তে আসা উচিত।

বাচ্চারা দেখো, চারিদিকে কত লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির। মন্দিরের নির্মান কর্তার সাথে দেখা করে জানতে চাওয়া উচিত, "আপনি যার মন্দির বানিয়েছেন, জানেন কি উনি সেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন কিভাবে ? আবার কি ভাবেই বা তা খুইয়েছেন ? শ্রীকৃষ্ণের চিত্র তো খুবই সুন্দর। ওনার ৮৪ জন্মের কাহিনীও খুবই সুন্দর। তাই এই চিত্রটা বেশ বড় আকারের বানানো দরকার। বাবা আরও জানাচ্ছেন, কেউ এলে তাকে যুক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আপনি কি গীতা পাঠ করেছেন ? যদি তা পড়ে থাকেন তবে বলুন, গীতার ভগবান কে ? এমনই যুক্তি সহকারে সবাইকে বোঝানো উচিত। এই যে প্রবাদ বাক্য আছে, তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমিও ..... এর প্রকৃত অর্থ হলো সেই হিসাবে ব্রহ্মাই হলেন তোমাদের মাতা। অতএব ওনার সাথে সম্বন্ধ রাখাটা অতি জরুরী। আর যদি ওনার সাথে প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক না থাকে, তবে তো এই ব্রাহ্মণ জীবনটাই বৃথা। তবে আর শিববাবার আশীর্বাদী-বর্সা পাবেই বা কি ভাবে ? তোমার যা লড়াই-ঝগড়া তা তো তোমার পুরোনো শত্রুদের সাথে। এটাই কেউ বোঝে না যে, প্রকৃত লড়াই তো চলে রাবণরূপী বিকারের সাথে। এই প্রবাদ বাক্যও তো আছে, সত্য-পথের নৌকা নড়বে-চড়বে কিন্তু ডুববে না তা কখনও। অতএব তোমাদের জীবন-যাত্রাতেও এমন নড়া-চড়া আসতে থাকবে। যা অন্য সৎসঙ্গগুলিতে এসব নড়া-চড়ার বিষয়ে কোনও উল্লেখই হয় না। কিন্তু এখানে তো মায়ার সাথে যুদ্ধ চলে। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবাকে বুঝতে পারছো, ততদিন তোমরা তা লিখে ওনাকে জানাবে, কিন্তু তোতা-পাখীর মতন শোনা ও শেখানো বুলি আওড়াবে না। অন্যরা তো জংলী তোতা-পাখীর মতন, তারা আসবে আবার যাবেও। কিন্তু তোমাদেরকে তো জানতেই হবে সেই আল্ফ-কে অর্থাৎ আদি-পিতাকে। প্রজা তো অনেক হবে, কিন্তু রাজার পদ প্রাপ্তির জন্য গুণধারী ক'জনই বা আছে ! যদি প্রদীপের শিখার প্রতিই নিজেকে সমর্পণ করে ফেলো তবে তা খুব মুস্কিলের ব্যাপার হয়েই দাঁড়াবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

নৈশ ক্লাস :-
বাচ্চারা - তোমাদের উদ্দেশ্যে বাবার নির্দেশ হলো যে, প্রকৃত বাচ্চারা নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। উত্তরে বাচ্চারা বলে, বাবা সেই সময়টাই তো পাওয়া যায় না। বাবার প্রশ্ন হলো - তবে সময় তোমাদের কোথায় চলে যায় ? নিশ্চয় মায়া তোমাদের সেই সময়কে চুরি করে নেয়। এই মায়াও যে খুবই শক্তিশালী, তাই তো নিরিবিলিতে বাবাকে স্মরণ করবার সময়টুকুও দেয় না তোমাদের। আর তাই তো তোমরা বাবাকে জানাও যে, পুরো দিনের মধ্য কেউ আধা ঘন্টা, কেউ বা ২০ মিনিট, আবার কেউ অনেক চেষ্টা করার পর পুরো দিনের মধ্যে দু ঘন্টা স্মরণ করতে পারো। যারা দু-ঘন্টা স্মরণের যোগ করো, তারা হাত ওঠাও। এ তো স্থুল স্মরণ। কিন্তু অতীতের পুরোনো স্মরণের জের তো চলেই আসছে। যা বিদেহী আত্মার আধ্যাত্মিক স্মরণ। যার কোনও চোখ-কান হয় না। তাই তো বাবা বার বার বলেন, নিজেকে আত্মা ভেবে আত্মিক ভাবধারায় লাগাতর ওনাকে

স্মরণ করে যেতে। এবার আবার বাবা জানতে চাইছেন - বাচ্চারা, এভাবে তোমরা কতক্ষণ স্মরণ করো ? লৌকিকে বাচ্চারা যখন খেলতে যায়, তখন স্কুলের শিক্ষকের কথাও তাদের মনে থাকে। আবার ঘরে যখন পড়তে বসে, তখনও শিক্ষকের কথাই মনে থাকে। এগুলি সব স্থুল স্মরণ। এই ধরণের স্মরণ যথেষ্ট কষ্টসাধ্যও বটে। তাই বাবা আবার জিজ্ঞেস করছেন- নিজেকে আত্মা ভেবে আত্মিক-স্বরূপে যে যে বাবাকে দু-ঘন্টা স্মরণ করতে পারবে, তারা হাত ওঠাও। এতে লজ্জা পেও না কিন্তু সঠিক কথা বলো।

বাচ্চারা, তোমরা যখন এখানে বসে বাবার মুরলী শুনতে থাকো, তখন তোমাদের মন ও বুদ্ধি কেবল সেদিকেই না থেকে যদি অন্যদিকে চলে যায়, তবে তো তা বুদ্ধিতে সেভাবে ধারণ করাই যায় না। যেমন সকালে এক-ঘন্টা বাবা যা বোঝান, তখন সেই এক-ঘন্টাই কি পুরোপুরি বাবাকে স্মরণ করতেই থাকো, নাকি তোমাদের বুদ্ধি তখন বাইরেও চলে যায় ? তোমাদের ক্রমিক পুরুষার্থের ধরণ দেখে মনে হয়, বুদ্ধি এদিক-ওদিক অবশ্যই চলে যায়। সবকিছুই ততটা মন দিয়ে শোনো না। যদি সবকিছুই মন দিয়ে শুনে তা নোট করে রাখো, তখন বাবা অবশ্যই বলবে, হ্যাঁ এই বাচ্চার যোগের পুরুষার্থ ঠিক আছে। অতএব বাবার মুরলী শোনার সময় সম্পূর্ণ রূপে তার প্রতি মনোনিবেশে যন্তবান হতে হবে আর পয়েন্টসগুলিকে পুরোপুরি লিখে রাখতে হবে নোটেবুকে। আর যদি সেই ধারাবহিকতায় ছেঁদ পড়ে, তখন সেই পয়েন্টসগুলিকেই তো ভুলে যাবে।

বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলছেন- ওহে বাচ্চারা, হার্টফেল করে মৃত্যু হওয়া খুবই সুখের। এতে তোমার বা আমার-এই ব্যাপারটাই থাকে না। কোথাও বসে বসে পড়ে গেলেই অজ্ঞান হয়ে ভবলীলী সাঙ্গ, ব্যস। এরপর আর জ্ঞান ফেরে না। তাই এটা খুব সুখের মৃত্যু। যদিও এতে লোকেরা কান্না-কাটি করবে, কিন্তু তুমি নিজে তো খুশী হবে এই ভেবে যে, বাঃ যা হয়েছে ভালই হয়েছে। কি সহজ এই মৃত্যু, এতে কোনও ভোগ ভুগতেই হলো না। মৃত্যু-বরণ যদি করতে হয় তবে এমন মৃত্যুকেই আহ্বান করা উচিত। আর তা না হলে কত প্রকারের ঔষধ, নার্স, ইত্যাদি কত কিছুই না লাগে; তাই যে বসে বসে এভাবে পুরোনো জুতোর মতন শরীরকে ছাড়তে পারে, সে কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যায়। এমন ভাবে শরীর ছাড়াটাই তো সবচেয়ে ভাল। এরপর তো তোমরা দেখতে পাবে, বিনা কারণেই হঠাৎ করে চারদিকে কত বোম্ব পড়ছে আর সবাই বসে বসেই (হার্টফেলের মতন) মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। সবাইকে যে যেতে হবে (ঘরে)। তখন তোমাদের চেহারায় হাসি ফুটে উঠবে। যেমন কখনও কখনও কারও খুব সুন্দর মৃত্যু হলে, প্রত্যক্ষকারীরা বলে যে উনি যেন এখনও জীবন্ত এমনই মনে হচ্ছে। তার মুখাবয়বে যেন হাসি হাসি ভাব থাকে। দেখে যেন মনেই হয় না, উনি মারা গেছেন। যেহেতু মৃত্যুকালে তার আত্মা আনন্দ সহকারেই দেহ ত্যাগ করেছে। তাই আত্মা যদি হাসিমুখ হয় বাইরের চেহারাতেও তখন সেই হাসির ভাব ফুটে ওঠে -তাই না ? যেহেতু আত্মার তো কখনও মৃত্যুই হয় না, এর কোনও ক্ষয় নেই। আত্মা কেবল শরীর ছেড়ে বেড়িয়ে যায়। সুতরাং আত্মা খুব আনন্দের সাথেই হাসতে হাসতে সেই শরীর ত্যাগ করে। একেই বলা হয় কর্মাতীত অবস্থা। এই অবস্থাকেই বলা হয় সর্বোচ্চ অবস্থা। বাচ্চারা, তোমাদেরও কিন্তু এমনি ভাবেই যেতে হবে। শরীর বিষয়ে কোনও সম্পর্কই যেন না থাকে মনে এবং তখন আর অন্য কিছু যেন না আসে মনে। সাপের খোলস ত্যাগ করার মতন করে শরীরকে ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ যাকে বলা হয় সর্বোত্তম সুন্দর। সত্যযুগে এমনটাই হয়ে থাকে। দেবতারা নিজেদের ইচ্ছা-খুশী অনুযায়ী হাসতে

হাসতে দেহত্যাগ করে। অতএব এখন থেকে এখানে বসে তারই অভ্যাস করতে হবে। পরে সেই অভ্যাসকে আরও বাড়াতে হবে।

বাচ্চারা, তোমরা এই বাবাকে কত ভালবাসার সাথে স্মরণ করো। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় মোস্ট বিলাভেড (most beloved), পরম প্রিয়, খুব মিষ্টি। মানুষদেরকে তো আর পরমপ্রিয়, মোস্ট বিলাভেড বলা যায় না। বাবা আরও জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, আমি যেমন তোমাদের বাবা, তেমনি তোমাদের শিক্ষকও আমি এবং সর্বোপরি তোমাদের সদগুরুও বটে। তাই যদি কখনও শিক্ষককে ভুলে যাও তো তখন বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। এই বাবা আবার তোমাদের গাইড-ও। পাণ্ডাকেই গাইড বলা হয়। একমাত্র ইনি তোমাদের দুঃখ নিবারণ করে শান্তিধামে নিয়ে যেতে পারেন। এরপরে সেখান থেকে (বি.কে.-দের) পৌঁছে দেন সুখধামে। তাই তো তোমাদের এই জ্ঞানের ঘাস খাওয়ানো হয় যাতে এসবের বিচার-সাগর চিবোতে (মন্থন) থাকো তোমরা। যেমন ভাবে গরু লাগাতর তার জাবর কাটতেই থাকে অর্থাৎ রোমন্থন করা। অবশ্য তোমাদের ক্ষেত্রে তা মুখের জাবর কাটা নয়, মনের ভিতরে সেসবেরই মনন-চিন্তন-মন্থন করতে হবে। বাবা তার বাচ্চাদের বলছেন, "তোমরাও যেমন-আমিও তেমনই। আমি তো আরও কম সময় পাই। যেহেতু আমার বুদ্ধিযোগ তো আবার বাইরের জগতেরও কাজ করে। যেমন, কখনও কারও চিঠি এলো, কারও হয়ত কারও সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি হলো, কখনও এটা তো কখনও ওটা .....। এভাবেই সারাদিন বুদ্ধিকে নানাদিকে খাটাতে হয়। তবুও কিন্তু (স্মরণের যোগ) বাচ্চাদের থেকে বাবার কাছে তা সহজ লাগে, যেহেতু শিববাবা যে সর্বদাই তার সাথে সাথেই থাকে। ভোজন খেতে বসার সময় ব্রহ্মাবাবা ভাবেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আগে শিববাবাকে স্মরণ করে নেই। হয়ত, মাত্র ২ বা ৩ মিনিট তা স্মরণে থাকে, তারপরেই আবার তা অস্মরণ হয়ে যায়। স্মরণের যাত্রা যেন তখন হাওয়ার মতন উবে যায়। বাচ্চারা, তোমরাও তা চেষ্টা করে দেখো। অবশ্য স্মরণের যাত্রায় সহজ হতে গেলে সময় তো একটু লাগবেই। তাই না ? আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি তাদের ঈশ্বরীয় বাপদাদার স্নেহ-সুমন হৃদয়ের স্মরণ, গভীর প্রেম ও প্রাণভরা ভালবাসা ও শুভরাত্রি জানাচ্ছেন। মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি ঈশ্বরীয় সন্তানদের প্রতি তাদের ঈশ্বরীয় পিতার নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাথে খুব সদ্ভাব ও ভালবাসা বজায় রেখে একসাথে চলতে হবে। সবাই একত্রিত হয়ে আলোচনা করে যুক্তিপূর্ণ এমন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে সবার কাছেই বাবার সংবাদ ও বাণী সুন্দরভাবে পৌঁছতে পারে।

২) যেহেতু এখন বিনাশের সময় অতএব এক ও একমাত্র এই সত্য বাবার সাথে মধুর সম্পর্ক রাখতে হবে। যোগযুক্ত হয়ে আত্মাকে শুদ্ধ ও পবিত্র বানাতে হবে।

বরদান :- অবিনাশী ড্রামার প্রতিটি রহস্যকে জেনে নিয়ে সদা হাসি-খুশীতে থেকে নলেজফুল ত্রিকালদর্শী হও

বিস্তার :- যে বাচ্চা নলেজফুল-ত্রিকালদর্শী হয়, সে কখনও কোনও বিষয়েই অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হয় না। যদি কেউ গালমন্দ বা অপমান করে, তবুও সে রাজী-খুশী ভাবেই থাকে। যেহেতু ড্রামার প্রতেকটি রহস্যকেই যে জানে, তাই কখনই সে বিরক্ত হয় না। বিরক্ত সেই হয়, যে ড্রামার রহস্যকে বুঝতে পারে না। তাই সর্বদা নিজেকে এই স্মৃতিতে রাখবে, সব পরিস্থিতিতেই নিজেকে যদি খুশীতেই না রাখতে পারলাম তবে আর ভগবান বাবার বাচ্চা হলাম কি করে। অতএব, সে সদা রাজী-খুশীতে থেকে, বাবার নিকটস্থ বাচ্চা হয়ে বাবার সমান গুণের অধিকারী হয়।

স্লোগান :- যে ব্যর্থ থেকে ইনোসেন্ট (নির্দোষ) থাকে সে প্রকৃত অর্থে সেন্ট (মহাত্মা)।